গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ পত্রিকা

তথ্যসূত্র

১৭ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৪১৯/২০১২

ISSN 2278–5922

সার্ধশতজন্মবর্ষে

কবির মদনকুমারী বসু

শুধু কবিকথা বা কাব্যকথা নয়, সঙ্গে থাকছে
অগ্রন্থিত আত্মকথা, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ এবং কবির বংশলতিকা

সম্পাদক

সুব্রত রায়চৌধুরী

মোহিনীমোহন সরদার

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পুনর্নির্মাণে মানকুমারী বসুর অবদান

ষোড়শ শতকের শেষ[১] লগ্নে কবি মুকুন্দ তাঁর 'অভয়ামঙ্গল'[২] কাব্য শেষ করার পর সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূলত জনপ্রিয়তাবশত এবং পালাগেয়ের জীবিকা অর্জনের জন্য কাব্যটির শত শত পুঁথি[৩] অনুলিখিত হয়েছিল; এমনকি ছাপাখানার প্রচলন যখন থেকে শুরু হয়েছে প্রায় সেই সময় থেকেই ছাপার অক্ষরেও[৪] মুকুন্দের কাব্যের কম সংস্করণ ও সম্পাদনা প্রকাশিত হয়নি ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীতে। শুধু তার গ্রন্থের বিভিন্ন সংস্করণ ও সম্পাদনা কেন, ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীতে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয় অবলম্বন করে রচিত হয়েছে একাধিক কবিতা।[৫] মুকুন্দের কবিপ্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে আধুনিক কবিরা তাঁর কাব্যের বিভিন্ন অংশকে নিজেদের কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। কখনো বা প্রশস্তি[৬] কবিতায় চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর কাহিনিকে আধুনিক কবিতায় রূপান্তর করতে গিয়ে কবিরা চতুর্দশপদী কবিতা[৭] প্রশস্তিমূলক কবিতা,[৮] বিষয় পরিচয় জ্ঞাপক দীর্ঘ কবিতা,[৯] গীতিকবিতা[১০] প্রভৃতি আধুনিক কাব্যরূপের আশ্রয় নিয়েছেন। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের বিষয়কে আধুনিক কবিরা এভাবে প্রকাশ করায় একদিকে যেমন মুকুন্দের কবিপ্রতিভা একালেও স্বীকৃতি পেয়েছে; অন্যদিকে তেমনি বিষয়ের অভিনবত্বে এবং চমৎকারিত্বে আধুনিক পাঠক ও গবেষকদের কাছেও তা আস্বাদ্য এবং অলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। মধুসূদন দত্ত [১১] থেকে শুরু করে সুশীলকুমার মজুমদার,[১২] অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য[১৩], সুধীর গুপ্ত[১৪] প্রমুখ খ্যাতনামা পেশাদার কবি ও কবিত্বপ্রতিভা সম্পন্ন

অখ্যাত সাধারণ সাহিত্যরস পিপাসু ব্যক্তিও এই কর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। এঁরা প্রত্যেকেই মুকুন্দের কবিত্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে, কাব্যের বিষয় বিন্যাস ও বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে মূল কাব্যের কোনো কোনো অংশকে তাঁদের কবিতার বিষয় করে তুলেছেন। প্রাগাধুনিক সাহিত্য প্রকরণে[১৫] আধুনিক কবিতার নানান রীতি[১৬]কে প্রয়োগ করে কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্যকে আধুনিক সাহিত্য চর্চার উপযোগী করে তুলেছেন।

'শ্রীবীরকুমারবধ'[১৭] রচয়িত্রী মানকুমারী বসু কবিকঙ্কণ চণ্ডী' কাব্যের বণিক খণ্ডের কাহিনি অবলম্বন করে 'কারাবাসে শ্রীমন্ত' নামের ১১১ চরণ বিশিষ্ট ১২ অধ্যায়ের একটি দীর্ঘ কবিতা রচনা করেছেন। কবিতার শেষে লেখিকা জানিয়েছেন।

> "অমর কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডী গ্রন্থোক্ত 'শ্রীমন্তের মশান' অবলম্বনে লিখিত। স্থানে স্থানে মূলের সহিত অনৈক্য হইয়াছে। ভরসা করি এ দোষ মার্জ্জনীয়।"[১৮]

দীর্ঘ এই কবিতাটিতে কারাবাসে শ্রীমন্তের আত্মোপলব্ধিকেই বাস্তবায়িত করা হয়েছে। উন্মুক্ত স্বাধীনচেতা নবীন কিশোর শ্রীমন্ত হঠাৎ বন্দী হয়ে উপলব্ধি করছে জীবনের চরম সত্যকে। সেই উপলব্ধিরই আধুনিক কাব্যরূপ প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য কবিতায়।

গুরুর কাছে তর্কযুদ্ধে পরাজিত শ্রীমন্ত অপমানিত হয়েছে। গুরু তাকে 'জারজ' বলে সম্বোধন করায় সেই অপমান তীব্র হয়ে তার কিশোর মনকে বিচলিত করে তুলেছে। তার পিতার প্রকৃত পরিচয়টি জানার জন্য কিশোর শ্রীমন্ত মা খুল্লনা এবং বড়মা লহনাকে পীড়াপিড়ী করে জানতে পেরেছে তার বাবা ধনপতি সদাগর; ব্যবসা বাণিজ্য করতে সিংহলে (বর্তমান শ্রীলঙ্কায়) গেছেন। অগত্যা গুরু ও সহপাঠীদের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পিতাকে উদ্ধার করতে এবং বাণিজ্য করতে শ্রীমন্ত সিংহলে যাওয়ার সংকল্প করেছে। কিশোর পুত্রের এইরূপ মনোভাবে শঙ্কিত হয়ে খুল্লনা দেবী চণ্ডীর শরণাপন্ন হয়েছে। দেবী খুল্লনাকে শ্রীমন্ত রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন, শ্রীমন্তকে সপ্তডিঙ্গা তৈরী সহ সমুদ্র যাত্রার অন্যান্য সমস্ত উপকরণই যুগিয়েছেন। দেবীর সহায়তায় মাতৃ-আশীর্বাদ নিয়ে অবশেষে শ্রীমন্ত সিংহলের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে।

নানা স্থান পেরিয়ে যখন শ্রীমন্তের নৌকা কালীদহে পৌঁছেছে তখন দেবী চণ্ডী শ্রীমন্তের সঙ্গে মায়া খেলায় লিপ্ত হয়ে তাকে কমলেকামিনী রূপ দেখিয়েছেন। নির্জন সমুদ্রে পদ্মের উপরে সুন্দরী নারীমূর্তি ও তাঁর হাতী গলধকরণ এবং উদ্‌গীরণ দৃশ্য দেখে মুগ্ধ শ্রীমন্ত বারে বারে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। সিংহলে উপস্থিত হয়ে রাজা শালিবাহনকে সেই দৃশ্যের কথা বর্ণনা করেছে সে, এমনকি উত্তেজিত হয়ে ঝোঁকের বশে রাজাকে শ্রীমন্ত সেই দৃশ্য দেখানোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধও হয়েছে। উভয়ের মধ্যে চুক্তি হয়েছে শ্রীমন্ত যদি কালীদহে দেবীর কমলেকামিনী রূপ দেখাতে পারে তবে রাজা শালিবাহন তাকে রাজকন্যা সুশীলা সহ অর্ধেক রাজ্য দান করবেন আর যদি না

দেখাতে পারে তবে দক্ষিণ মশানে রাজা শ্রীমন্তকে হত্যা করবেন।

দেবীর ছলনায় শ্রীমন্ত রাজা শালিবাহনকে সেই দৃশ্য দেখাতে না পারায় রাজা পূর্বশর্ত অনুযায়ী শ্রীমন্তকে বন্দী করেছেন। এই কারাগারে বন্দী শ্রীমন্তের আত্মপোলব্ধিকেই লেখিকা চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন কবিতাটির সর্বাঙ্গে। কারাগারে বন্দী অবস্থায় শ্রীমন্ত উপলব্ধি করেছে, বন্দীশালার বাইরে বিশাল বিস্তৃত উদার আকাশে এই যে উদ্দীপ্ত চন্দ্র-তারা, প্রকৃতির মধ্যে মৃদু হিল্লোলে প্রবাহিত বাতাস একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে বয়ে চলেছে, রৌপ্যকান্তি সদৃশ উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় সমগ্র পৃথিবীর, দশদিক পরিপূর্ণ, এমন আনন্দপূর্ণ ধরণী, পরিপূর্ণ প্রকৃতির আদর আজ আর মানুষ গ্রহণ করতে পারে না। নশ্বর মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থে বিশ্ব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। ঠিক যেমন নিজকৃত পাপে শ্রীমন্ত সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে আজ শ্রীমন্তের এমন দশা। কারণ সে চোর-দস্যু নয়, অথচ ললাট লিখনের ফল স্বরূপ তার এই শাস্তি, বন্দীদশা। রাজার আদেশে রাত্রি শেষে তাকে হত্যা করা হবে। প্রবাসে স্বজন বান্ধবহীন এমন আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কায় শ্রীমন্ত তাই রাত্রি জেগে বসে আছে। কখনো বা তার কিশোর চঞ্চল মন 'মাতৃকোলের' আরাম খুঁজতে চেয়েছে। কারণ শিশুকাল থেকে শ্রীমন্ত জেনে এসেছে, 'জগতের যত পাপ, নারীহত্যা, ব্রহ্মশাপ'—এসবই মাতৃকোলের সংস্পর্শে ধ্বংস হয়ে যায়। শুভ-অশুভ, সিদ্ধিলাভ, ঋদ্ধি প্রাপ্তি, পবিত্র ধর্মের আচরণ, দেবতার মহিমা প্রভৃতি পার্থিব জগতের এই সব মূল্যবান বস্তুর থেকেও বেশি দামি মাতৃস্নেহ, মাতৃকোল। তাই আজ এইরূপ নির্জনে কারাগারে বসে শ্রীমন্তের মনে হয়েছে মাতৃকোল মানে অমৃতমাখা আরামের ঠাঁই।'

মাতৃস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি গৃহের পরিচিত চিত্রটিও শ্রীমন্তের চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। তার মনে পড়েছে, বাঙালির গৃহ আসলে চির পরিচিত স্নেহের ঘর, যেখানে নিত্য স্নেহের বন্ধন বিরাজ করে। সন্ধ্যাকালে প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধূলার যে আনন্দ তা আজ কারাগারে বসে শ্রীমন্তের কাছে স্মৃতি রোমন্থনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার মনে হয়েছে আসলে সেটি ছিল 'সোনার শৈশব', যেখানে মা স্নেহের ফাঁদ পেতে হাতে যেন 'চাঁদ' ধরে দিতেন। আদর-সোহাগ ভরা মায়ের সেই স্নেহের সহস্র চুম্বন স্মৃতি আজও শ্রীমন্তের চোখে জল আনে, মনে জাগায় স্মৃতি মেদুরতা, মুখে অস্ফুট স্বরে সে উচ্চারণ করে 'কোথা সে আজন্ম স্মৃতি সে স্নেহ-ভবন।'

শুধু শ্রীমন্তের গৃহ, মাতৃস্নেহ, সহপাঠী বন্ধুবান্ধবদের স্মৃতিই নয়, কারাগারে বসে মৃত্যুর আগে তার মনে জেগেছে বিদ্যালয়ের স্মৃতিও। একই আসনে একই প্রাণে-মনে অধ্যয়নরত শ্রীমন্ত ও তার সহপাঠীদের উপস্থিতির স্মৃতি আজ তার চোখে জল

আনে। তার মনে পড়ে কত অন্যায়, কত অপরাধ সেখানে হতো, কিন্তু নিত্য ক্ষমা ও পথ চলার চরম আনন্দে তাদের সেইসব দিনগুলি কি নির্বিঘ্নেই না অতিবাহিত হয়েছে। প্রীতি, মান, সর্বদা যেন জড়িয়ে থাকতো, সামান্য কর্মেও আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেত, সেদিনকার সেই উচ্চ হাস্যের কলরোল আজও যেন শ্রীমন্তের কর্ণে বাজে। সেদিনের সেই সরল সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব, হাসি, ঠাট্টা, আনন্দ, সেই বিদ্যালয় আজও শ্রীমন্তের কাছে কেবলই সুখ স্মৃতি।

কারাগারে বসে শ্রীমন্তের স্মৃতিপটে ভেসে উঠেছে তার জন্মভূমি, তার পাড়া, বন-জঙ্গল-পথ-ঘাট-নদ-নদীর রূপ। শ্রীমন্তের মনে হয়েছে পল্লি বাংলার সেই যে মনোমুগ্ধকর রূপ তা যেন অনন্য। গভীর শোকের সঙ্গে শ্রীমন্ত স্মরণ করেছে সেকথা ঃ

কোথায় জন্মভূমি, বন পথ, নদী,
সেই পশু পাখিকুল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
সে চিত্র যে চিত্রপটে আঁকা নিরবধি;
দেবের করুণা সমা,
সেই যে স্বদেশ রমা,
আজি মা তোমার যেন পাইনা অবধি;
কি অমৃত মাখা তব ধূলি বালি নদী!

বাংলার প্রকৃতি, পশু-পাখিকুল, তরুলতা, ফল-ফুল এসবই যেন এক সুদক্ষ চিত্রকরের চিত্রপটে আঁকা অসাধারণ ছবি। কোনো দেবতার করুণায় যেন এর সৃষ্টি। স্বদেশের সেই রূপ ও তার মহিমা কারাগারে বসে শ্রীমন্তের সুখস্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে। এই বিজনে বসে শ্রীমন্তের মনে হয়েছে অন্য কোনো দেশের সঙ্গে তার তুলনা চলে না। তার জন্মভূমি, পল্লিপ্রকৃতির কোনো অবধি নেহ; অমৃতমাখা সেই বাংলার ধূলি-বালি-নদী তুলনারহিত।

এরপর অবশ্য শ্রীমন্ত তার সিংহলে আসার কারণ ব্যাখ্যা করেছে। অত্যন্ত অল্প বয়স হলেও বিমাতার নিষ্ঠুরতা, রাগ, কালভুজঙ্গীর রূপ শ্রীমন্তের মনকে খুবই নাড়া দেয়। তার মা দীন, পরাধীন এবং সর্বদা অশ্রুমুখি। পিতা নিরুদ্দেশ বলে মায়ের ঘরে-বাইরে যে অপমান, সেই অপমান থেকে মাকে উদ্ধার করার জন্য কিছু না বুঝেই শ্রীমন্ত সিংহলে এসেছে। কারণ সিংহলেই তার পিতা এসেছিল বহুকাল আগে। সেই সিংহলেই পিতার মতো তারও যেন মরণবীণা বেজেছে। সমুদ্রপথে আসতে আসতে কালীদহে শ্রীমন্ত কমলেকামিনীরূপী নিয়তির লীলা দেখে মুগ্ধ হয়েছে। তা যে প্রপঞ্চ, সেটি তার শিশুমন বিশ্বাস করতে চায় নি। মরুভূমিতে যেমন মরীচিকা থাকে, এ কাহিনি যেন তারই অনুরূপ। এ প্রতীতি তখনও শ্রীমন্তের প্রগাঢ় হয়নি। তার সরল

শিশুমন 'এ কুহক' না বুঝেই রাজাকে সেই দৃশ্য দেখানোর প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়েছে। রাজাকে সেই দৃশ্য দেখানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। রাজাকে সেই মায়াদৃশ্য দেখানোর জন্য যখন তারা উভয়েই সমুদ্রের ধারে এসে উপস্থিত হয়েছে তখন সেই দৃশ্যের কোনো চিহ্ন নেই দেখে শ্রীমন্ত উৎকট মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হয়েছে। তার মনে হয়েছে কি লজ্জা, কি উন্মত্ততা, কি উৎকট মিথ্যাচার। শ্রীমন্ত সেদিন নিজে কিছুই বুঝতে পারেনি, রাজাকেও বোঝাতে পারেনি। কি কুক্ষণে কি কুবচনে যে শ্রীমন্ত এই দৃশ্যের বর্ণনা সেদিন রাজাকে করেছিল, তা তার স্মরণে এসেছে, আত্মক্ষোভে সে প্রায় মূহ্যমান হয়ে পড়েছে।

কমলেকামিনীর দৃশ্য দেখানোর পূর্বশর্ত অনুযায়ী রাজা শ্রীমন্তকে হত্যার আদেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশেই শ্রীমন্ত এখন বন্দী। মৃত্যু তার শিয়রে। মশানে অপেক্ষা করছে তারই যম। কিন্তু তার শিশুমন অস্থির। যে সরলতা, যে বিশ্বাস, যে সততা নিয়ে সে জীবন অতিবাহিত করার কথা ভেবেছে, যে পবিত্রতা তার অস্থিমজ্জার ভিতরে, আজ মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে মরার ফলে তা নষ্ট হবে। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃত সত্যেরও মৃত্যু ঘটবে জেনে শ্রীমন্ত ব্যথাতুর। এ কলঙ্ক শ্রীমন্তের কাছে মৃত্যুর থেকেও ভীষণ যন্ত্রণার। তাই শ্রীমন্ত বিশ্বচক্ষুকে, ত্রিলোচনকে সাক্ষী মেনেছে। তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ যে প্রবঞ্চনা, শঠতা নয় বিশ্বচক্ষু ত্রিলোচনকে শ্রীমন্ত সেই সত্য প্রচারের জন্য দায়িত্ব সঁপেছে। তার বিশ্বাস দেশের জনগণ একদিন বুঝবেন শ্রীমন্তের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ তার অদৃষ্ট, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস। এই আশায় শ্রীমন্ত আত্মপক্ষ সমর্থন করতে চেয়েছে। শুধু তাই নয়, মৃত্যুর আগের দিন রাত্রে রবি, শশি, গ্রহ, তারা, জন্ম-জন্মান্তরের সাথী যারা তাদেরকে সাক্ষী রেখে শ্রীমন্ত পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে চেয়েছে। তার নাবিক বন্ধু এবং ভ্রাতৃসদৃশ কর্ণধারকে কাছে ডেকে সমস্ত ইতিহাস, তার ক্ষোভ শ্রীমন্ত বলে যেতে চেয়েছে এবং কর্ণধারকে দেশে ফিরে যাওয়ার পরামর্শও সে দিয়েছে। শ্রীমন্তের বক্তব্য তার মৃত্যুর পর কর্ণধার দেশে ফিরে গিয়ে যেন তার মাকে প্রকৃত সত্যটি জানায়। এই দেশ যেন অবরুপুরী, এখানে দয়া-মায়া, স্নেহ-প্রীতি ভালোবাসার যেমন কোনো স্থান নেই, তেমনি ক্ষমাধর্ম, নরম হৃদয়বৃত্তি, সুবিচার প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মানবিক প্রবৃত্তিরও কোনো স্থান নেই। সিংহল দেশ মরুভূমির মতো নির্মম, শুষ্ক, রুক্ষ এবং সরল জীবন যাপনের পক্ষে প্রতিকূল বলে শ্রীমন্তের মনে হয়েছে। তাই কর্ণধারকে শ্রীমন্ত বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য উপদেশ দিয়েছে। স্নেহ, প্রেম, দয়া, প্রীতি, ক্ষমতা প্রভৃতি সূক্ষ্ম প্রবৃত্তির মরুদ্যান সেই বাংলাদেশ যার তুলনা কোথাও নেই বলে শ্রীমন্তের শিশুমন গর্ব অনুভব করেছে। কর্ণধারকে শ্রীমন্ত আরো অনুরোধ করেছে, এই বিজনে তার মৃত্যু যে চোরের মতো নয় বরং বীরের মতো—কর্ণধার একথা যেন শ্রীমন্তের মাকে জানায়। মৃত্যুকে সে যে

ভয় পায় নি, হাসিমুখে মৃত্যুকে বরণ করার সাহস যে তার ছিল, সে সব কথাও যেন কর্ণধার শ্রীমন্তের মাকে বলে। অন্তিমে মা সর্বমঙ্গলা শিবার নাম করে যে শ্রীমন্ত মৃত্যুবরণ করছে সেকথাও কর্ণধার যেন শ্রীমন্তের মাকে বলতে না ভোলে।

দীর্ঘ এই কবিতাটিতে মানকুমারী বসু অসাধারণ সৌন্দর্য সৃষ্টির দক্ষতায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'বণিকখণ্ডের' কাহিনিকে বুনে দিয়েছেন। মূলকাব্যে শ্রীমন্তের সিংহল যাত্রার যে গল্প বর্ণিত হয়েছে তাকে একরকম পরোক্ষে রেখেই সিংহল কারাগারে শ্রীমন্তের বন্দী দশার যে পরিচয় দিয়েছেন কবি, তা মূল কাব্যানুগ হয়েছে। তবে কারাগারে শ্রীমন্তের কল্পনা, যেটি এই কবিতার মূল বিষয় তা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকাহিনিতে পাওয়া যায় না, এখানে কবির মৌলিক চিন্তাধারারই পরিচয় আছে। শ্রীমন্তের শিশুমন, মাতৃভক্তি, বন্ধু বাৎসল্য, প্রকৃতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি এবং সর্বোপরি তার সরলতা, বিশ্বাস প্রভৃতির যে পরিচয় আছে তাতে শ্রীমন্ত চরিত্রটি একদিকে যেমন মনোমুগ্ধকর হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি তার করুণ পরিণতি ও আর্তি আপামর জনসাধারণের মনকে করুণরসে দ্রবীভূত করে তুলেছে। পিতৃ অন্বেষণে গিয়ে কুহক না বুঝে শ্রীমন্তের শিশুমন যে ফাঁপরে পড়েছে তা আসলে একনায়কতন্ত্রের ক্রিয়াকর্মের চরম প্রকাশ; যেখানে ইচ্ছাপূরণের বিঘ্নতায়, সত্যরক্ষা করতে না পারার অপরাধে একজন অসহায় শিশুকেও হত্যা করতে এদের বাঁধে না। সমগ্র কবিতাটিতে তাই সরল শিশুমনের সঙ্গে জটিল রাজনীতির অঙ্কটিকে সার্থকভাবে বুনে দিয়েছেন কবি। শ্রীমন্তের মুখ দিয়ে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাসটিকেও সার্থক পুনর্নির্মাণ করেছেন তিনি। বিষয় পরিচয় জ্ঞাপক দীর্ঘ কবিতা হলেও সেকালে কবিতাটি জনপ্রিয়তার চরমে পৌঁছেছিল। কবিতাটিতে মুকুন্দ চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তা ও তাঁর কাব্য সৃষ্টির দক্ষতার পরিচয়টিই তুলে ধরা হয়েছে আধুনিক পুনর্নির্মাণের আঙ্গিকে।

প্রসঙ্গ নির্দেশ ও মন্তব্য

১। ড. ক্ষুদিরাম দাসের মতে ১৫৯৫-এর আগে কিছুতেই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল রচনা হতে পারে না। আমরাও এই মত সমর্থন করি। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : মুকুন্দরামের গ্রামত্যাগ ও কাব্য রচনা প্রসঙ্গ, ২৫ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭৫, পৃ : ১০৮।

২। মুকুন্দ চক্রবর্তী রচিত কাব্যের নাম নিয়ে নানান বিতর্ক আছে, আমরা 'অভয়ামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী', 'অম্বিকামঙ্গল' প্রভৃতি নামে কাব্যটিকে চিহ্নিত করতে চাই। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : মৎপ্রণীত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান, কোডেক্স, ২০১০, পঞ্চম অধ্যায়, পৃষ্ঠা : ২১৩-২২০।

৩। পঞ্চানন মণ্ডলের মতে '৩৪৭টির স্পষ্ট হিসাব পাওয়া যায়'—দ্রষ্টব্য : 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডীর পুরাতন পুঁথির অনুসন্ধান, আশিস্‌কুমার দে ও বিশ্বনাথ রায় সম্পাদিত,

কবিকঙ্কণ-মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল : আলোচনা ও পর্যালোচনা, পুস্তক বিপনি, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা : ৪৪৭।

৪। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেডের ব্যাকরণের হাত ধরেই মুকুন্দের কাব্যের প্রথম ছাপাখানায় পদার্পণ। তারপর ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে বহু ছাপা সংস্করণ লক্ষ্য করা গেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : মৎ প্রণীত কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : বৈচিত্র্যের অনুসন্ধান, কোডেক্স; ২০১০, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা—৫১-১১৬।

৫। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য, নির্বাচিত প্রবন্ধ, ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যসঙ্গী, ২০১১, মৎপ্রণীত প্রবন্ধ, চণ্ডীমঙ্গল : আধুনিক কবিতায় রূপান্তকরণ, পৃ-৪৪৯-৪৭০।

৬। যেমন নগেন্দ্রনাথ সোম রচিত 'স্বর্গীয় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (জ্যোতি : ১৩১৩, জন্মভূমি, মাঘ-১৩১৩), সুশীল কুমার মজুমদার রচিত 'কবিকঙ্কণ' (অলকা, আশ্বিন, ১৩৪৬) প্রভৃতি প্রশস্তিমূলক কবিতার কথাই এখানে বিবেচ্য।

৭। মধুসূদন দত্ত রচিত 'কমলেকামিনী', 'শ্রীমন্তের টোপর' (চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১৮৬৬) প্রভৃতি কবিতার কথা এখানে উল্লেখযোগ্য।

৮। আমরা পূর্বেই স্বীকার করেছি নগেন্দ্রনাথ সোম রচিত 'স্বর্গীয় মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (জ্যোতি : ১৩১৩, জন্মভূমি, মাঘ-১৩১৩), সুশীলকুমার মজুমদার রচিত' 'কবিকঙ্কন' (অলকা, আশ্বিন ১৩৪৬) প্রভৃতি প্রশস্তিমূলক কবিতা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয় অবলম্বন করে সেকালে রচিত হয়েছিল। এই কবিতাগুলি আজো বিশেষ জনপ্রিয়।

৯। মানকুমারী বসু রচিত 'কারাবাসে শ্রীমন্ত' (নব্যভারত, ভাদ্র ১৩১৫), অপূর্বখৃষ্ণ ভট্টাচার্য রচিত, 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম' (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮) প্রভৃতি কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১০। নগেন্দ্রনাথ সোম রচিত 'ফুল্লরা' (নবপ্রতিভা, চৈত্র ১৩০৮), সুশীলকুমার মজুমদার রচিত' কবিকঙ্কণ' অলকা, আশ্বিন ১৩৪৬) প্রভৃতি কবিতায় বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফূটন অতিমাত্রায় ক্রিয়াশীল বলে কবিতাগুলিকে আলাদাভাবে গীতিকবিতা বলতে চেয়েছি আমরা।

১১। 'কমলেকামিনী', 'শ্রীমন্তের টোপর' (চতুর্দশপদী কবিতাবলী, ১৮৬৬) প্রভৃতি কবিতা মধুসূদন রচনা করেছিলেন, যার বিষয়বস্তুতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্পষ্ট অনুসরণ ছাড়াও হুবহু একাধিক চরণের (ব্যবহার করা হয়েছে)।

১২। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনিও কবিকে বিষয়বস্তু করে সুশীলকুমার মজুমদার লিখেছিলেন 'কবিকঙ্কণ' (অলকা, অশ্বিন ১৩৪৬) নামের কবিতাটি, যেখানে কবির মৌলিকতা আজো বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে)

১৩। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিষয় অবলম্বন করে অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য লিখেছিলেন 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম' (ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮) নামের কবিতাটি।

১৪। কবিকঙ্কন চণ্ডী কাব্যের বিষয় অবলম্বন করে সুধীর গুপ্ত লিখেছিলেন ফুল্লরা (সংহতি, কার্তিক, ১৩৬৮), 'শ্রীকবিকঙ্কণ' (সংহতি, বৈশাখ, ১৩৭২) নামের একাধিক কবিতা।

১৫। প্রাগাধুনিক সাহিত্য প্রকরণ অর্থে মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি প্রচলিত মধ্যযুগের সাহিত্যধারাকেই চিহ্নিত করা হচ্ছে।

১৬। আধুনিক কবিতার রীতি অর্থে সনেট, গীতিকবিতা, প্রশস্তিমূলক কবিতা, বিষয় পরিচয়জ্ঞাপক দীর্ঘ কবিতার কথাই এখানে বিবেচ্য।

১৭। কবিতাটির রচয়িতার নামে বলা আছে 'শ্রীবীরকুমারবধ' রচয়িত্রী, এ থেকেই আমরা নিশ্চিত হয়েছি, কবিতাটির রচয়িতা মানকুমারী বসু।

১৮। দ্রষ্টব্য : শ্রীবীরকুমারবধ রচয়িত্রী (মানকুমারী বসু) 'কারাবাসে শ্রীমন্ত' নব্যভারত, ২৬ খণ্ড, ৫ সংখ্যা, ভাদ্র-১৩১৫, পৃ : ২৫৩।